বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
অষ্টবিংশতিতম খ- বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৭

মধ্য-আয়ের দেশে উত্তরণের প্রত্যাশায় বাংলাদেশ : সমস্যা ও সম্ভাবনা

মনজুর হোসেন*
মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন

১। ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ২০২১ সাল নাগাদ অর্থাৎ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির পূর্বেই দেশকে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত করা। বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় প্রায় ৬৯০ ডলার, যা ৯৭৫ ডলারে উন্নীত করতে হবে। সরকার তার এই লক্ষ্য বাস্ড়বায়নের জন্য রূপকল্প (vision) ২০২১ ঘোষণা করেছে, যা বাস্ড়বায়নের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan 2010-2021) ও দীর্ঘ বিরতির পর পুনরায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) প্রণয়ন করেছে।

সরকার ২০১১ সালের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৬.৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে পুরো দশক জুড়ে ৭ শতাংশ বা তার বেশি হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। ১৯৯০ সালে যে আয় ছিল বর্তমানে তা ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দারিদ্র্যের হারও ৫৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৪০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ১৯৯০ সালের পর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলা করা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কোনো বছরই হ্রাস পায়নি, বিশ্বের খুব কম দেশেরই এ রেকর্ড রয়েছে। তাছাড়া বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে গড়ে ৬ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে যা অনেক স্বল্পোন্নত দেশের তুলনায় ভালো। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত করার যে লক্ষ্য তা অর্জন কঠিন হলেও কিন্তু অসম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন উলেণ্ডখযোগ্যভাবে বিনিয়োগ (দেশীয় ও বিদেশী) বাড়ানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং সে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে রাখা। এ বিষয়গুলোর প্রতি নজর রেখে ভবিষ্যৎ বাজেট এবং অন্যান্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য যে সকল খাতের প্রতি গুর-ত্ব দেওয়া প্রয়োজন এ প্রবন্ধে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২। বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী আর্থিক খাতে সৃষ্ট সংকট বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ড় করেছে। এসত্ত্বেও বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহ সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

---

*লেখকদ্বয় যথাক্রমে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর রিসার্চ ফেলো এবং রিসার্চ এসোসিয়েট।

১ বিশ্বব্যাংক তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে ৪টি অর্থনৈতিক শ্রেণিতে ভাগ করে। যে সব দেশের মাথাপিছু আয় ৯৭৫ ডলার বা তার নিচে তারা নিম্ন আয়ের দেশ, ৯৭৬ ডলার থেকে ৩,৮৫৫ ডলার নিম্ন মধ্য-আয়ের দেশ; ৩,৮৫৬ ডলার থেকে ১১,৯০৫ ডলার উচ্চ-মধ্যআয়ের দেশ ; এবং ১১,৯০৬ ডলারের উপরে মাথাপিছু আয়ের দেশকে উচ্চ আয়ের দেশের তালিকাভুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশের শ্রম শক্তি রপ্তানিতে বিরূপ প্রভাব পড়লেও দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

২.১। প্রবৃদ্ধি-বিনিয়োগ প্রেক্ষাপট

২০১০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা প্রথমে ৫.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও পরবর্তীতে সংশোধন করে তা ৬ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। ২০১১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬.৭ শতাংশ যা বিগত বছরগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ এবং পরবর্তী বছরগুলোর জন্য অধিক জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ১)। ২০১১ অর্থবছরে ৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হতে পারে যার জন্য বিনিয়োগ হার জিডিপি-র ২৬.৪ শতাংশ হতে হবে, ২০১০ অর্থবছরে এ হার ছিল ২৪.৬ শতাংশ এবং তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ অর্থবছরে জিডিপি-র ৩২ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (সারণি ১)।

সারণি ১
মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১১-২০১৫

নির্দেশকসমূহ	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ				
				২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
জিডিপি'র হার (শতাংশ)	৬.২	৫.৭	৬.০	৬.৭	৭.২	৭.৬	৮.০	৮.০
বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	২৪.২	২৪.৪	২৪.৬	২৬.৪	২৮.৪	৩০.০	৩১.৬	৩২.০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (জিডিপি'র শতকরা হারে)	৩.৩	৩.১	৪.১	৪.৯	৫.৩	৫.৬	৬.১	৬.৬

উৎস: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০।

বাংলাদেশে সরকারি বিনিয়োগের হার জিডিপি-র প্রায় ১৫ শতাংশ, যা প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় কম। অন্যদিকে উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিনিয়োগের হার জিডিপি-র মাত্র ৪ শতাংশ, তবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বর্তমান অর্থবছরে এ হার ৫ শতাংশের উপর হওয়া প্রয়োজন। সরকারি বিনিয়োগ না বাড়াতে পারলে বেসরকারি বিনিয়োগও বাড়বে না এবং বিনিয়োগের পরিবেশও উন্নত হবে না। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০১৫ অর্থবছরে বিনিয়োগের হার হবে ৩২ শতাংশ এবং এডিপির আকার জিডিপির ৬.৬ শতাংশ হতে পারে। যদি প্রক্ষেপণকৃত বিনিয়োগ সঠিক ক্ষেত্রে হয় এবং এডিপি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলে তা মধ্য-আয়ের দেশে রূপান্তরিত হতে যথেষ্ট অবদান রাখবে।

২.২। খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপট

২০১০ অর্থবছরে বিভিন্ন কৃষি উপখাতের প্রবৃদ্ধি বেশ সন্তোষজনক ছিল (কৃষিতে ৪.৭ শতাংশ; তার মধ্যে শস্যে ৫.২ শতাংশ)। তবে কৃষিতে একই রকমের প্রবৃদ্ধি আগামী বছরেও ধরে রাখা সরকারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে এবং সরকারের বিভিন্ন নীতিগত সহায়তা বজায় থাকলে কৃষিতে আরও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। কৃষির প্রবৃদ্ধির জন্য শস্যখাত গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হবে। অতীত রেকর্ড থেকে দেখা যায়, নিয়মিতভাবে সেবা খাতের উল্লেখযোগ্য অবদানের কারণেও মাঝারি মানের প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। গত দশকে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬ শতাংশ, ২০১১ অর্থবছরে এর কাছাকাছি হওয়া উচ্চাভিলাষী নাও হতে পারে। বৈশ্বিক মন্দা বাংলাদেশের শিল্প খাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। তবে শিল্পখাতে অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জন ছাড়া বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে না। ২০১৫ অর্থবছরের প্রক্ষেপণকৃত ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে যদি কৃষিখাতের বর্তমান প্রবৃদ্ধি অর্জন বজায় রাখার পাশাপাশি শিল্প ও সেবা খাতে আরও অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায়।

২.৩। মুদ্রানীতি প্রেক্ষাপট : মূল্যস্ফীতি এবং মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা

যদিও ২০১০ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির গতি কমে এসেছে তথাপি ২০১১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হবে। বৈশ্বিক অর্থনীতির চাঙ্গাভাব বিশ্ববাজারে একটি মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করবে যা আবার বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির উপরও চাপ সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতিতে খাদ্য মূল্যস্ফীতির একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। সরকারের কৃষি বান্ধবনীতি এবং অন্যান্য নীতির কারণে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের নিচে থাকতে পারে। যদিও সরকার আশা করছে ২০১১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে স্থির থাকবে,কিন্তু তা বজায় রাখা কঠিন হবে। সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান করতে হবে, সাথে সাথে সঠিক মুদ্রানীতির ভূমিকাও আগামী বছর মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। গত বছর মূল্যস্ফীতির যে চাপ বাংলাদেশ মোকাবিলা করেছে তাতে মুদ্রা নীতির ভূমিকা সুস্পষ্ট ছিল না। বরং অভ্যন্তরীণ সরবরাহ স্বল্পতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের উচ্চ মূল্যের কারণে মূল্যস্ফীতির এ ঊর্ধ্বগতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু বর্তমানে মূল্যস্ফীতির যে চাপ রয়েছে তা মুদ্রা তারল্যের বিস্তার এবং বৈদেশিক মুদ্রানীতির কারণে হতে পারে। নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) পুঞ্জিভূত হওয়া এবং তার কার্যকর ব্যবহারের অনুপস্থিতিতে তারল্য বিস্তার কিছু চাপ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে শেয়ার বাজার, আবাসন শিল্পে এবং খাদ্যবর্হিভূত দ্রব্যের দামের ক্ষেত্রে। এ বিষয়গুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভবিষ্যৎ মুদ্রানীতিতে অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

মূল্যস্ফীতির গতিধারা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, মূলত উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতির জন্য গড় ও পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতির হার বেশি এবং এটি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে অষ্ট্রেলিয়াতে খরা এবং রাশিয়াতে দাবানলের কারণে সেসব দেশ কর্তৃক গম রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক বাজারে গমের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে, যা বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির উপর চাপ আরও বাড়াতে পারে।

চিত্র ১: মূল্যস্ফীতি (জুলাই ২০০৯ থেকে মে ২০১০)পয়েন্ট-টু পয়েন্ট

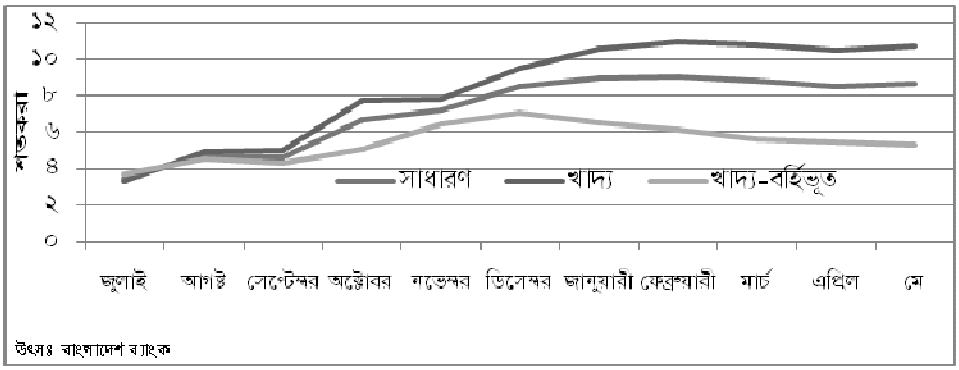

চিত্র ২: গড় মূল্যস্ফীতি (১২ মাসের),জুলাই ০৯ থেকে মে ১০

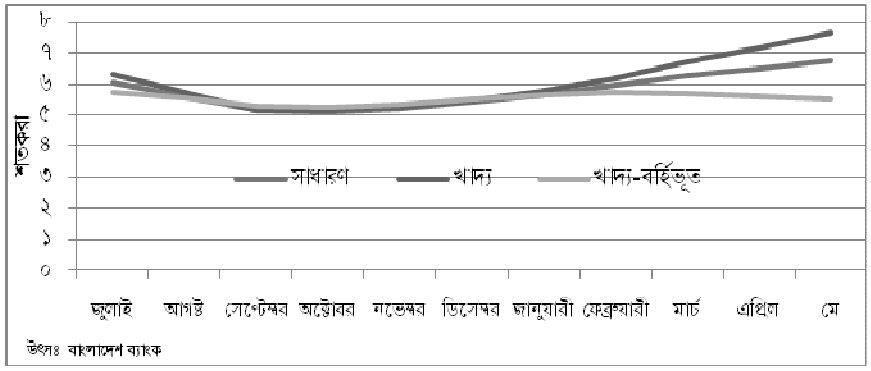

২.৪। বৈদেশিক খাতের প্রেক্ষাপট

বৈশ্বিক মন্দা কাটিয়ে উঠার যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে করে ২০১০–১১ অর্থবছরে বৈদেশিক খাতের দৃশ্যকল্প (Outlook) ভালো। রপ্তানি ও আমদানি বাড়বে বলে আশা করা যায়। দেশীয় বিনিয়োগ যদি বাড়ানো যায়, তাহলে আগামী অর্থবছরে মূলধন যন্ত্রপাতির আমদানিও বাড়বে । এতে বাণিজ্য ভারসাম্যের উপর প্রভাব পড়তে পারে। তাছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে বলে আশা করা যায়। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে কখন এবং কিভাবে সামনের দিনগুলোতে বিশ্ব অর্থনীতি চাঙ্গা হয় তার উপর।

প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরে রপ্তানি খাতের প্রবৃদ্ধি হবে ১৫ শতাংশ, যা ২০১৫ অর্থবছরে ১৭.২ শতাংশে দাঁড়াবে। আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৬ শতাংশ এবং ২০১৫ অর্থবছরে ১৮.৭ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ ছিল

১১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৫ অর্থবছরে ৩১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণি ২

বৈদেশিক খাতের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১১-২০১৫

নির্দেশকসমূহ	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ				
				২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
রপ্তানি (শতকরা পরিবর্তন)	১৭.৪	১০.১	১৮.০	১৫.০	১৬.০	১৬.৫	১৭.০	১৭.২
আমদানি (শতকরা পরিবর্তন)	২৫.৬	৪.২	৬.০	১৬.০	১৭.৫	১৮.০	১৮.৫	১৮.৭
প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ(বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৭.৯	৯.৭	১১.৫	১৪.০	১৭.১	২০.৮	২৫.৩	৩১.৪
চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জিডিপি'র শতাংশে)	০.৯	২.৮	৩.৭	৩.৬	৩.৩	৩.০	২.৭	২.৩

উৎস: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০।

৩। বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেট ও এডিপি বরাদ্দ

যদিও ২০০৯-১০ সালের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ৩০,৫০০ কোটি টাকা ছিল, মূলত ধীরগতির বাস্ড়বায়নের কারণে পরবর্তীতে তা কমিয়ে ২৮,৫০০ কোটি টাকায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট ১,৩২,০০০ কোটি টাকার মতো, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১৬ শতাংশ বেশি। পূর্বের বছরগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, এ বাজেটও পুরোপুরি বাস্ড়বায়িত হবে না। বাংলাদেশের রাজস্বনীতির ব্যবস্থাপনায় এটি একটি নৈমিত্তিক চিত্র। এডিপি-র আকার ৩৮,৫০০ কোটি টাকা। উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের জন্য এডিপির আকার যেমন বাড়ানো প্রয়োজন তেমনি এর সঠিক বাস্ড়বায়নও প্রয়োজন। এর পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগের উচ্চমান নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় বাজেটে যদিও এক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকে তথাপি এতে একটি দেশের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলো প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের বাজেট ও বাজেট দৃশ্যকল্পের আলোকে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যগুলো কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি ৩

বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেট ও এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)

অর্থবছর	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	এডিপি	সংশোধিত এডিপি
২০১০-১১ (প্রাক্কলন)	১৩২০০০ (১৫.৯৭%)	-	৩৮০০০ (২৪.৬০%)	-
২০০৯-১০	১১৩৮১৯ (১৩.৮৬%)	১১০০০০ (১৬.৮৫%)	৩০৫০০ (১৯.১৪%)	২৮৫০০ (২৩.৯১%)
২০০৮-০৯	৯৯৯৬২ (১৪.৭২%)	৯৪১৪০ (০.৫৭%)	২৫৬০০ (-৩.৩৩%)	২৩০০০ (২.২২%)
২০০৭-০৮	৮৭১৩৭ (২৪.৯৫%)	৯৩৬০৮ (৪০.০৫%)	২৬৫০০ (১.৯২%)	২২৫০০ (৪.১৭%)
২০০৬-০৭	৬৯৭৪০	৬৬৮৩৬	২৬০০০ (৬.১২%)	২১৬০০ (০.৪৭%)

উৎস: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০।

৩.১। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ও গুণগত মান

মধ্য-আয়ের পথযাত্রায় যে সকল অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার আলোকে বড় আকারের এডিপি গ্রহণযোগ্য। ২০১০-১১ অর্থবছরে এডিপির আকার ৩৮ হাজার কোটি টাকার মতো, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশি। অতীত রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, মূল এডিপির প্রায় ৮৫ শতাংশ বছর শেষে বাস্ড়বায়িত হয়। সেদিক থেকে এডিপির আকার যত বড় হবে তত ভালো। যদিও বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য এডিপির আকার বাড়ানো প্রয়োজন, কিন্তু তা বাস্ড়বায়নযোগ্য ও বাস্ড়বসম্মত হওয়া প্রয়োজন।

বিগত এডিপিগুলোর একটি বড় দুর্বলতা হচ্ছে সড়ক প্রকল্পগুলোর প্রাধান্যতা। বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পে অপ্রতুল সম্পদ বরাদ্দের কারণে প্রকল্পগুলো অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ফলে প্রকল্প বাস্ড়বায়ন ধীর গতি সম্পন্ন হয়। এডিপি বাস্ড়বায়নের বাধাগুলো অতিক্রম করতে না পারলে মধ্য-আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কাঙ্খিত সময়ের মধ্যে সম্ভব নাও হতে পারে।

৩.২। এডিপি বাস্ড়বায়নে করণীয়

এডিপি বরাদ্দে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা তুলে ধরা হলো:

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রকল্প সংক্রান্ড় লক্ষ্য এবং বাস্ড়বায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় প্রকল্প বাস্ড়বায়নে বিভিন্ন সংস্থা বা মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতার জন্য তাদেরকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে জবাবদিহির ব্যবস্থার প্রবর্তন;
- আইএমইডিকে আরও শক্তিশালী করা এবং মন্ত্রণালয়গুলোর পরিকল্পনা কোষগুলোকে কার্যকর করা;
- যে সব প্রকল্পের জন্য সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিত রয়েছে এবং যে সব প্রকল্প চালু রয়েছে ও অগ্রগতি সন্ড়োষজনক কেবল সেগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া;
- এডিপি বাস্ড়বায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংশিণ্টষ্ট সংসদীয় কমিটিগুলো (যেমন- অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, এস্টিমেটস কমিটি)

জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। নিয়মিতভাবে কমিটিগুলো এডিপি বাস্ড়বায়ন মনিটর করে ব্যর্থতার জন্য দায়ী সংশিণ্টষ্ট মন্ত্রণালয়/ব্যক্তির বির"দ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারে;

- কৃষি, বিদ্যুৎ এবং সামাজিক খাতগুলোর মতো গুর"ত্বপূর্ণ খাতগুলোর প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সেগুলোর বাস্ড়বায়ন পর্যালোচনা করা।

৪। রাজস্ব খাতের দৃশ্যপট

সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এসব পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যয়ের অর্থ সংগৃহীত হয় রাজস্ব আদায় তথা কর ও কর-বহির্ভূত খাতের আয় থেকে। বাংলাদেশে সরকারি আয়ের বেশিরভাগই সংগৃহীত হয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক সংগৃহীত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর থেকে। পরোক্ষ করের মধ্যে রয়েছে ভ্যাট, আমদানি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক যা থেকে এনবিআর-এর সংগৃহীত করের ৭৩ শতাংশ আসে।

সারণি ৪

বাজেটে রাজস্ব পরিস্থিতি, ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১

রাজস্ব বাজেট	২০০৯-১০ (সংশোধিত)		২০১০-১১	
	বিলিয়ন টাক	% মোট রাজস্ব	বিলিয়ন টাক	% মোট রাজস্ব
এনবিআর কর রাজস্ব	৬১০.০	৭৬.৭	৭২৫.৯	৭৮.২
আয় ও মুনাফার উপর কর	১৬৫.৬	২০.৮	২১০.১	২২.৬
মূল্য সংযোজন কর	২২৮.০	২৮.৭	২৭০.৯	২৯.২
আমদানি শুল্ক	১০৪.৩	১৩.১	১০৮.৯	১১.৭
আবগারী শুল্ক	২.৬	০.৩	২.৮	০.৩
সম্পূরক শুল্ক	১০৪.৯	১৩.২	১২৮.৭	১৩.৯
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৪.৭	০.৬	৪.৭	০.৫
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	২৯.৬	৩.৭	৩৪.৫	৩.৭
মোট কর রাজস্ব	৬৩৯.৬	৮০.৫	৭৬০.৪	৮১.৯
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১৫৫.১	১৯.৫	১৬৮.১	১৮.১

উৎস: সরকারের বাজেট,অর্থ বিভাগ।

বর্তমানে আমাদের মোট রাজস্বের মধ্যে করের অবদান প্রায় ৮০ শতাংশ, যার মধ্যে মূল্য সংযোজন করের অবদান ৩৭.৭ শতাংশ। বাংলাদেশে কর রাজস্বের মধ্যে ভ্যাট ও প্রত্যক্ষ কর সবচেয়ে বর্ধনশীল কর (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩: কর রাজস্বের গতিধারা (কর/জিডিপি-র অনুপাত), ২০০৫-০৬ থেকে ২০০৯-১০

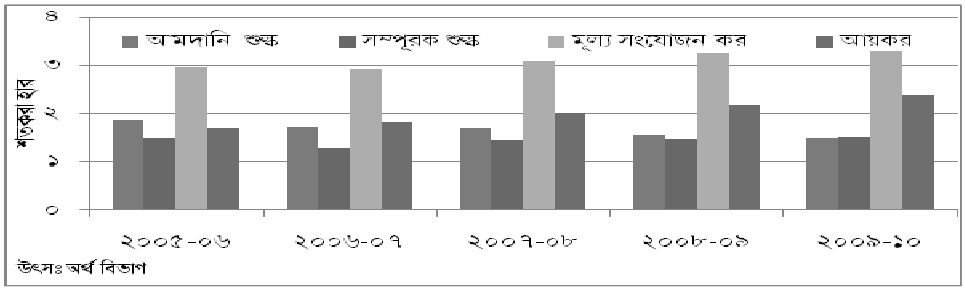

সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের ধারা থেকে এটা স্পষ্ট যে, রাজস্ব সংগ্রহে যেখানে মূল্য সংযোজন কর ও আয়করের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে আমদানি শুল্কের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে (চিত্র ৩)।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের জন্য রাজস্ব আয় জিডিপি-র প্রায় ১৪ শতাংশ হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে এই হার প্রায় ১০ শতাংশ, যা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায়ও কম (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪: দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে কর/জিডিপি অনুপাত

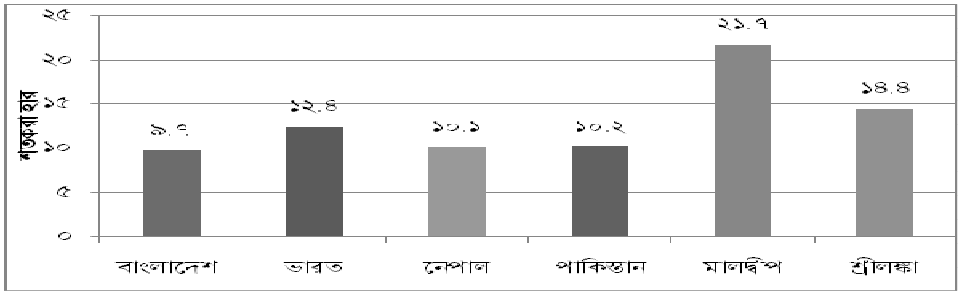

নিম্ন কর জিডিপি অনুপাত নির্দেশ করে বাংলাদেশ একটি করবিমুখ জাতি। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হারের সাথে কর জিডিপি'র অনুপাত সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেখানে ২০০১ অর্থবছরে কর জিডিপি-র অনুপাত ছিল প্রায় ৭.৮ শতাংশ, সেখানে এক দশক পরেও তা দুই-অংকের কোটা পার হতে পারেনি। যদিও মোট রাজস্ব জিডিপির অনুপাত কিছুটা বেশি (কর জিডিপি'র অনুপাতের তুলনায়) অর্থাৎ প্রায় ১১.৫ শতাংশ, যার মধ্যে কর রাজস্ব প্রায় ৮০ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে কর-রাজস্ব অনুপাত সবচেয়ে কম। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে মালদ্বীপের কর-জিডিপি অনুপাত সবচেয়ে বেশি, ২১.৭ শতাংশ, ভারতে এ হার ১২.৪ শতাংশ। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ কর মোট করের প্রায় ২৫ শতাংশ, ভারতে এ হার ৮১ শতাংশ। তাই কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করতে হলে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক গবেষণায় (Begum ২০০৬) দেখা গেছে, বাংলাদেশে কর ক্ষমতার সূচক হচ্ছে ০.৪৯৩, যা নির্দেশ করে বাংলাদেশে কর রাজস্বের পুরো ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় না। অর্থাৎ কর রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের কার্যকর ক্ষমতা রয়েছে। একই গবেষণায় দেখা গেছে, tax bouyancey অনুপাত ১.২৩, যা নির্দেশ করে যদি জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় তাহলে কর ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন ছাড়াই কর রাজস্ব ৬.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

৪.১। রাজস্ব আয়ের প্রক্ষেপণ

রাজস্ব আয়ের প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক কৌশল রয়েছে, যার মধ্যে Trend analysis এমন একটি কৌশল যা অতীত তথ্যের গতি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে প্রক্ষেপণ করা হয়। এই মডেলের সাহায্যে ন্যূনতম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সহজে স্বল্পমেয়াদে ভালো প্রক্ষেপণ করা যায়। এই পদ্ধতির একটি সুবিধা হচ্ছে এর জন্য অতিরিক্ত কোনো ব্যাখ্যামূলক চলকের প্রয়োজন হয় না। তবে এই পদ্ধতির একটি দুর্বলতা হলো যে রাজস্ব আয়ের পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে এটি তেমন তথ্য দিতে পারে না।

আলোচ্য প্রবন্ধে রাজস্ব আয়ের প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে Linear Autoregressive Model (AR)-এর সহায়তা নেওয়া হয়েছে, কারণ অন্যান্য Trend model-এর চেয়ে ব্যবহৃত মডেলটির ফলাফল অতীত তথ্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যবহৃত মডেলটি হচ্ছে:

রাজস্ব আয় $_t = \beta_0 + \beta_1$ রাজস্ব আয় $_{t-1} + \varepsilon_t$,

মডেলটি OLS এর মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়েছে।

সারণি ৫

বিভিন্ন অর্থবছরের প্রক্ষেপণকৃত কর রাজস্ব, ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫ (মিলিয়ন টাকা)

নির্দেশকসমূহ	২০০৭-০৮ প্রকৃত	২০০৮-০৯ প্রকৃত	২০০৯-১০ প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ				
				২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
মোট রাজস্ব	৬০৫৩.৯ (১১.১)	৬৯১৮.০ (১১.৩)	৭৯৪৮.৪ (১১.৫)	৯১২৩.৮ (১১.৭)	১০৪৭৫.৫ (১১.৯)	১২০২৯.৯ (১২.০)	১৩৮১৭.৫ (১২.১)	১৫৮৭৩.৩ (১২.৩)
কর রাজস্ব	৪৮০১.২ (৮.৮)	৫৫৫২.৬ (৯.০)	৬৩৯৫.৬ (৯.৩)	৭৩৪৯.৪ (৯.৪)	৮৪৪৭.৮ (৯.৬)	৯৭১২.৭ (৯.৭)	১১১৬৯.৪ (৯.৮)	১২৮৪৬.৮ (৯.৯)
কর বহির্ভূত	১২৫২.৭ (২.৩)	১৩৬৫.৪ (২.২)	১৫৫২.৮ (২.২)	১৭৬৩.২ (২.৩)	২০০১.৮ (২.৩)	২২৭২.১ (২.৩)	২৫৭৮.৫ (২.৩)	২৯২৫.৮ (২.৩)
এনবিআর কর	৪৫৯৭.০ (৮.৪)	৫৩০০.০ (৮.৬)	৬১০০.০ (৮.৮)	৭০১০.১ (৯.০)	৮০৫৭.৯ (৯.১)	৯২৬৪.৪ (৯.২)	১০৬৫৩.৬ (৯.৩)	১২২৫৩.১ (৯.৫)

উৎস: লেখকদ্বয়ের নিজস্ব হিসেবে নির্ণিত। নোট: বন্ধনীর সংখ্যাগুলো হলো প্রক্ষেপণকৃত জিডিপি-র অনুপাত।

বিদ্যমান কর ব্যবস্থাপনায় যদি বড় ধরনের কোনো নীতিগত পরিবর্তন না আসে, তবে আমাদের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০১১ অর্থবছর শেষে জিডিপির ৯.৪ শতাংশ কর রাজস্ব (যার মধ্যে এনবিআর কর প্রক্ষেপনকৃত জিডিপি-র ৯ শতাংশ) এবং মোট রাজস্ব জিডিপি-র ১১.৭ শতাংশ হবে বলে (সারণি ৫)। ২০১৫ অর্থবছরে মোট রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫,৮৭৩ মিলিয়ন টাকা (যা প্রক্ষেপণকৃত জিডিপির ১২.৩ শতাংশ) এবং কর রাজস্বের পরিমাণ হবে ১২,৮৪৬ মিলিয়ন টাকা (যা প্রক্ষেপণকৃত জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশ)। তবে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এবং কর জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধির জন্য কর ব্যবস্থার পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে, বিশেষ করে প্রত্যক্ষ করের অনুপাত বৃদ্ধি করতে হবে।

৪.২। ব্যক্তিগত আয়কর ব্যাপ্তি বাড়ানোর পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশের কর ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত আয়ের[৯] উপর ৪টি প্রগতিশীল হারে কর ধার্য করা হয়। প্রায় ২৩ লাখ লোকের TIN রয়েছে, যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.৫ শতাংশ এবং TIN ধারীদের অধিকাংশই আবার ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করে না। কৃষিখাতের আয়কে অধিকভাবে করমুক্ত রাখা হয়েছে, যেমন: পোল্ট্রি, মৎস্য ও পশুখাতের আয়ের কর, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, হস্ড়শিল্পজাত পণ্য ইত্যাদি। ব্যক্তিগত আয়কর জিডিপির প্রায় ১ শতাংশ, যা বিশ্ব গড়ের (৩.৭ শতাংশ) চেয়ে অনেক কম। মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে হবে এবং ব্যক্তিগত আয়করের ব্যাপ্তি বাড়ানোর জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ নেওয়া যেতে পারে:

- করব্যাপ্তি বৃদ্ধির জন্য প্রশাসনিক প্রচেষ্টা জোরদার করা, বিশেষ করে যে সব এলাকাতে সক্ষম করদাতার সংখ্যা বেশি কিন্তু প্রকৃত করদাতার সংখ্যা কম;
- কর ব্যবস্থায় দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- জরিপের মাধ্যমে সম্ভাব্য আয়কর প্রদানকারীদের চিহ্নিত করার মাধ্যমে আয়কর প্রদানকারী ইউনিটের পরিধি আরও সম্প্রসারণ করা;
- আয়কর পদ্ধতি সহজ করা এবং অনলাইন পদ্ধতিকে আরও সহজ ও ব্যবহার উপযোগী করা;
- যে সকল TIN অকার্যকর সেগুলো চিহ্নিত করা এবং তদন্ড় করা; এবং
- শেয়ার বাজারের মূলধনী আয়ের উপর যৌক্তিক হারে কর আরোপকরণ।

৪.৩। কর্পোরেট আয়কর

- সকল ধরনের কর মওকুফ এবং ছাড় তুলে নেওয়া প্রয়োজন তবে ক্ষেত্রবিশেষে তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা;
- করমুক্তি বা ট্যাক্সহলিডে এবং অন্যান্য কর অবকাশগুলোর আয় প্রভাব নির্ণয়ের জন্য গবেষণা করা এবং প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থায় আপেক্ষিক সুবিধা যেমন: ADA (এডিএ কর) অথবা হ্রাসকৃত একক কর হার প্রবর্তন করা;
- মূলধনী দ্রব্যের উপর থেকে সকল ধরনের কর মওকুফ তুলে দেওয়া এবং যদি কোনো মূলধনী দ্রব্যের উপর কর মওকুফ প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে তবে তার উপর বিশেষ কর হার ধার্য করা যেতে পারে;
- ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিদের সাথে অন্যান্য মুনাফা অর্জনকারী শিল্পগুলোকে অন্ড়র্ভুক্ত করা যাতে করে বাণিজ্যিক করের উচ্চ সীমার (৪৫ শতাংশ) আওতা বৃদ্ধি পায়।

৪.৪। আমদানি শুল্ক

[৯] যাদের আয় ১,৬৫,০০০ টাকা এবং মহিলা ও সিনিয়র সিটিজেনদের (৭০ উর্ধ্ব বয়স) টাকা ১,৮০,০০০ টাকার উপরে হলে কর দিতে হয়।

- আন্তর্জাতিক চুক্তি বা আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে অথবা মানবিক কারণ জড়িত রয়েছে এমন ক্ষেত্র ছাড়া শুন্য (০) শুল্কহার উঠিয়ে দেয়া;
- সকল ধরনের মওকুফ হার বাদ দেওয়া, যদি বিশেষ বিবেচনায় কোনো মওকুফ দেওয়া হয় তবে তা ৩ মাস পূর্বে বা ৩ মাসের মধ্যে সংসদে পাশ করতে হবে,
- চার অংকের শুল্ক লাইনে সকল প্রকারের শুল্ক হারের বিভিন্নতা দূর করা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত এসআরও (SRO)-এর মাধ্যমে মধ্যমেয়াদি কর হার পরিবর্তনের ঐতিহ্য বন্ধ করতে হবে;
- ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত মোটরগাড়ি এবং অন্যান্য দ্রব্য যা সমাজের উচ্চবিত্তরা ব্যবহার করে তার উপর সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করা;
- বিদ্যমান আইনের ফাঁকফোঁকর দূর করে PSI (Pre-Shipment Inspection)-এর সেবার খুঁটিনাটি পরীক্ষা করা।

পদ্ধতিগত সংস্কার

- আমদানি-রপ্তানি শুল্কের ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়ার সংস্কার করে অধিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কম সময়ে প্রদান করা;
- কর কর্মকর্তাদের দায়িত্বে অবহেলা পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া।

৪.৫। মূল্য সংযোজন কর

মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এর আওতা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:

- ভ্যাটের আওতা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধির জন্য মাধ্যমিক কৃষি পণ্যসহ সকল সক্ষম পণ্য এবং সেবাকে ভ্যাটের আওতায় নিয়ে আসা;
- বিভাগীয় অফিস পর্যায়ে রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা দক্ষ করে তোলা;
- বিদ্যমান ভ্যাট নিয়মনীতি এবং আদেশ দক্ষ করা এবং ভ্যাট প্রদানের ফরম এবং পদ্ধতি সহজ করা;
- সকল পণ্যের খুচরা মূল্যের সাথে ভ্যাট সংযুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- যে সকল অঞ্চলে কর সংগ্রহ কঠিন সে সকল অঞ্চলে বিশেষ শ্রেণিতে ভ্যাট স্ট্যাম্প ব্যবহার করা।

৪.৬। অন্যান্য করসমূহ

স্থানীয় পর্যায়ের করসমূহ

- অবস্থান এবং জমি ব্যবহারের (আবাসিক এবং বাণিজ্যিক) বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন কর হার ধার্য করা এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য শহরগুলোর ক্ষেত্রেও একই নীতিমালা অনুসরণ করা।

ভূমি উন্নয়ন কর

- উর্ধ্বমুখী সংশোধিত কর হার নির্ধারণ;
- বৃহৎ ভূমি মালিকদের করের আওতায় নিয়ে আসা;
- ভূমির অবস্থান এবং ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কর হার ধার্য করা।

কর-বহির্ভূত আয়

ভূমি রেজিস্ট্রেশন

- সাব-রেজিষ্ট্রারের স্বেচ্ছাধীন সকল ক্ষমতা উঠিয়ে নেওয়া এবং রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সহজতর করা;
- বিভিন্ন স্থানের ভূমির মূল্য যুক্তিসঙ্গতভাবে ঠিক করা যা ক্রমবর্ধমান বাজার দামকে প্রতিফলিত করে;
- চলতি বাজার দাম ও স্থানের বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দালান ও ফ্লাটের ন্যূনতম দাম যুক্তিযুক্তভাবে স্থির করা।

৫। বিনিয়োগের অগ্রাধিকার খাতসমূহ

বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে নিম্নে উলেণ্ঢখিত ক্ষেত্রগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে:

- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যার আশু সমাধান এবং দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা;
- জলবায়ু পরিবর্তন;
- খাদ্য নিরাপত্তা;
- স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষার মান উন্নয়ন;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা এবং ICT খাতের উন্নয়ন;
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি হ্রাস করা;
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) পদ্ধতি কার্যকর করা;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ;
- বাহ্যিক আঘাত (external shock) মোকাবিলার জন্য রপ্তানি বহুমুখীকরণ;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন;
- মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং দারিদ্র্য-বান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জন।

আলোচ্য প্রবন্ধে উপরোক্ত খাতগুলোর বর্তমান অবস্থার আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫.১। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত: জ্বালানি নিরাপত্তা

সরকার ২০১১ সালের মধ্যে সবার জন্য যুক্তিযুক্ত দামে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছে। এলক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপও নিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বিদ্যুৎ খাতে এডিপি বরাদ্দ বিগত কয়েক বছরে কমেছে। যদিও বর্তমান সরকার ২০১০ অর্থবছরের বাজেটে বিদ্যুৎ খাতে আগের বছরের তুলনায় ৩২ শতাংশ বেশি বরাদ্দ রেখেছিল। পরবর্তী সময়ে সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দের পরিমাণ গত বছরের বাজেটের তুলনায় কম রাখা হয়েছে। আগামী বাজেটসহ ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে এ অর্থের সঠিক ও সময়মতো ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাবনার বিষয় এই যে, সংশোধিত বরাদ্দ প্রকৃত ব্যয় থেকে কম এবং তার গতি ক্রমাগতভাবে নিম্নমুখী।

সারণি ৬
বিদ্যুৎ খাতের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি
২০০৪-০৫	৩১৮৭.৮২
২০০৫-০৬	৩১৫৯.৪৩
২০০৬-০৭	২৪৮৫.২১
২০০৭-০৮	২৪৪৯.৪৬
২০০৮-০৯	৪১২.৫৩

উৎস: অর্থ বিভাগ, ২০১০।

বিদ্যমান বিদ্যুৎ পণ্যান্টগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে আরেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা দেখা দিবে, যা বিদ্যুতের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ব্যবধানের আরও অবনতি ঘটাবে। ২০১০ সালের মধ্যেই কতিপয় বিদ্যুৎ পণ্যান্ট মেয়াদ উত্তীর্ণের পর্যায়ে রয়েছে এবং পণ্যান্টগুলো যত পুরোনো হচ্ছে সেগুলোর দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া বিদ্যমান বেশিরভাগ পণ্যান্টই প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর এবং ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্যাস পাওয়া না গেলে গ্যাস নির্ভর পণ্যান্টগুলোর পরিচালনা অনিশ্চিত হতে পারে।

বিদ্যুৎ খাতের মাস্টারপণ্যান ২০০৫[৩] অনুযায়ী, ২০১২, ২০১৫ এবং ২০২০ সালে বিদ্যুতের চাহিদা হবে যথাক্রমে ৭,৭৩২, ৯,৭৮৬ ও ১৩,৯৯৩ মেঘাওয়াট। অর্থাৎ আগামী বছর (২০১১-১২) দুই হাজার মেঘাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে হবে। বর্তমান সময়ে মানুষ তাদের জীবনযাত্রায় গতি আনয়নের জন্য পারিবারিক কাজে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র ব্যবহার করছে এবং তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু মাস্টারপণ্যান এর চাহিদা প্রক্ষেপণে এই কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব এই চাহিদা প্রক্ষেপণ ন্যূনতম বিদ্যুৎ চাহিদার মাত্রা প্রদান করে যা অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে দেশের সঠিক উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই প্রক্ষেপণকৃত বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের সাথে সাথে নির্ভরযোগ্য প্রান্তিক মজুদ গড়ে তোলার জন্য

[৩] বিদ্যুৎ খাতের মাস্টারপণ্যানে (PSMP), যা ২০০৫-এ নবায়ন হয়, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিদ্যুতের চাহিদা সম্পর্কে একটি পরিমাপ করা হয়েছে।

সরকারকে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। তাই এ খাতের উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং সাথে সাথে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে সরকার এই খাতের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, কিন্ডু এগুলো যে গতিতে এগুচ্ছে তা থেকে বলা যায়, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অসম্ভব থেকে যাবে।

সারণি ৭

সরকারি ও ব্যক্তিগত উভয় খাতে ২০১৫ সাল নাগাদ যে সকল প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা

নং	বিবরণ	২০০৮ (প্রকৃত)	২০১১	২০১৩	২০২০
১।	স্থাপিত ক্ষমতা (মে: ও:) (নীট)	৫,৩০৬	৭,০৩০	৮,৮৬৫	১৬,৬৪৩
২।	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা (মেঃ ওঃ)	৪,১৩০ (প্রকৃত উৎপাদন)	৭,১৪৮	৮,৩৬৪	১৩,৯৯৩
৩।	নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন (মি: কি: ও: ঘ:)	২৪,৯৪৬	২৮,০০০	৩৩,০০০	৭২,২২২
৪।	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কি: মি:)	৭,৮৪৮	৮,৯৭৭	৯,৫৫৩	১২,০০০
৫।	গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)				
	(ক) ৪০০ কেভি ও ২৩০ কেভি	৫,৮৫০	৬,৮৫০	১২,৯১০	১৯,০৭৫
	(খ) ১৩২ কেভি	৭,৪৮৫	১০,৯৯০	১৩,৯৯০	২৭,৩৬৭
৬।	বিতরণ লাইন (কি: মি:)	২,৫৬,১৪৩	৩,০১,০০০	৩,৩০,০০০	৪,৭৭,৫৫৮
৭।	গ্রাহক সংখ্যা (লাখ)	১০৮.০০	১২৬.০০	১৪০.০০	২০৭.৬৭
৮।	বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	৫০,৭২৪	৫৩,৫০০	৫৬,০০০	৮০,০০০
৯।	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃওঃঘঃ)	১৭৫	১৯০	২১৮	৪৫০
১০।	বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা	৪৫%	৫২%	৬০%	৯০%

উৎস: পাওয়ার সেল, বিদ্যুৎ বিভাগ।

যদিও এই প্রকল্পগুলো সফলভাবে বাস্ড়বায়ন করা যায়, তারপরও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া এবং বর্তমান পণ্ট্যান্টের পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ৯,৭৮৬ মেঘাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে (বিআইডিএস ২০১০)। কারণ নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎ উৎপাদন পণ্ট্যান্টের প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত না করে কিভাবে উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন হবে, তা পরিষ্কার নয়।

কাঙ্খিত লক্ষ্য বাস্ড়বায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নিতে হবে। চাহিদা ও যোগানের মধ্যকার ব্যবধান দূর করার জন্য বেসরকারি খাতকে সঙ্গে নিয়ে সরকারকে আরও নতুন প্রকল্প নেওয়া প্রয়োজন। গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে স্বল্পমেয়াদে ডিজেলচালিত ক্যাপটিভ পাওয়ার পণ্ট্যান্ট স্থাপন এবং দীর্ঘমেয়াদে পারমাণবিক পাওয়ার পণ্ট্যান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ড় নেওয়া প্রয়োজন। জ্বালানি নিরাপত্তার অংশ হিসেবে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে গ্যাস, বিদ্যুৎ, কয়লা ইত্যাদি আমদানির দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা এখনই প্রয়োজন।

৫.২। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গলে যাচ্ছে মের“ অঞ্চলের বরফ। বৃদ্ধি পাচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের মতো সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর।

জাতিসংঘের আন্ড়ঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ড় প্যানেলের (IPCC) তৃতীয় সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠে পানির উচ্চতা ৪৫ সে. মি. বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১১ শতাংশ ভূখ”

সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হবে। জাতিসংঘের এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা এই শতাব্দীতে গড়ে ২.৮° সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পাবে এবং এই বৃদ্ধির হার ১.৮° এবং ৪.০ সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকবে (IPCC 2001)।

পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীর নাব্যতা হ্রাস, নদীভাঙন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আগামী বছরগুলোতে অনেক বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে। এসব দুর্যোগের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় হবে কৃষি খাত, যা বাংলাদেশের গুর"ত্বপূর্ণ খাত। এটি জিডিপি-তে ২০ শতাংশের বেশি অবদান রাখে এবং ৪৮ শতাংশের বেশি লোকের এখানে কর্মসংস্থান রয়েছে। কৃষির ন্যায় বাণিজ্য খাত সহ অন্যান্য খাতেও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। যেমন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে কোনো আঘাত আন্ড়র্জাতিক পণ্য বাজারে আঘাত হানবে যা আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশকেও প্রভাবিত করবে। ফলে এটি শিল্প উৎপাদনের সাথে সাথে সেবা খাতের উৎপাদনকে ব্যাহত করবে যা ভোগ ও বিনিয়োগকে সংকুচিত করতে পারে।

নদী ভাঙনের ফলে এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে হাজার হাজার লোক অভিবাসন করতে বাধ্য হবে, যা ঢাকাসহ অন্যান্য বড় শহরগুলোতে বস্ড়ি সমস্যা বৃদ্ধি করতে পারে। যা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ আমাদের পর্যটন খাতকে নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করবে।

সরকার ইতোমধ্যে ৭০০ কোটি টাকার ক্লাইমেট ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে। বিদেশি সাহায্যও এক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। তবে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সঠিক পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি) গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পগুলো বাস্ড়বায়ন করা, যাতে করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় এ মুহূর্তে করণীয় কী? বিশেষজ্ঞদের মতে সবচেয়ে গুর"ত্বপূর্ণ দুটি বিষয় হচ্ছে:

- দীর্ঘমেয়াদি আবহাওয়ার পূর্বাভাস পদ্ধতি প্রবর্তন করা অর্থাৎ কৃষকেরা যাতে এক মৌসুম আগেই আবহাওয়ার খবর জানতে পারে এবং সে অনুযায়ী ফসল উৎপাদনের পূর্ব প্রস্তুতি নিতে পারে। এখাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন, যাতে কারিগরি যন্ত্রপাতি এবং দক্ষতা অর্জন এখনই সম্ভব হয়। বাংলাদেশে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অত্যন্ড় উপেক্ষিত একটি বিষয়, যার প্রতি এখনই নজর দেওয়ার সময় এসেছে।
- দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বাঁধ নির্মাণ-এ দুটি বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

৫.৩। খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্যের পর্যাপ্ততা, জনগণের ক্রয়ক্ষমতার উন্নয়ন এবং খাদ্যের সুষম ব্যবহার এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ই হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা। বিগত তিন দশকে দেশে খাদ্য উৎপাদন প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। ২০১২ সাল নাগাদ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বাজেটে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন:

- সেচ এলাকার সম্প্রসারণ করে একাধিক শস্য উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা;

- কৃষি ভর্তুকি বৃদ্ধি করা;
- উচ্চফলনশীল বীজের উৎপাদন ও বিতরণ বৃদ্ধিকরণ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের ও সংরক্ষণের ধারনক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- কৃষি গবেষণা ও পুর্নবাসনে গুর"ত্ব প্রদান করা;
- কৃষি ঋণের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- আবাদি জমি যাতে হ্রাস না পায় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জনগণের খাদ্য ক্রয়ক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ;
- সামাজিক বেষ্টনীর সম্প্রসারণ এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ;
- সুষম খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পশুসম্পদ, মৎস্য, শাক-সবজি, ফলমূল অধিক হারে উৎপাদনের জন্য বাজেটে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে কৃষকগণ উৎপাদনে উৎসাহিত হয়;
- স্বাধীনতার সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ড় বাংলাদেশ খাদ্য শস্য উৎপাদনে উলেণ্ঢখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, বিশেষ করে ধান উৎপাদনে। সাধারণভাবে খাদ্যশস্যের অব্যাহত প্রবৃদ্ধি এবং বিশেষ করে বোরো উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য (বোরো মোট খাদ্য শস্যের ৫৫ শতাংশ অবদান রাখে) সময়মত পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং যুক্তিযুক্ত দামে রাসায়নিক সার (ইউরিয়া এবং নন-ইউরিয়া উভয়ই) সরবরাহ করা অত্যন্ড় প্রয়োজনীয়।

৫.৪। স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার মান উন্নয়ন

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য (MDGs)-এর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত দুটি খাত হচ্ছে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত। মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে এই দুটি খাতের কাঙ্খিত লক্ষ্য বাস্ড়বায়ন করতে হবে।

৫.৪.১। স্বাস্থ্যসেবা

বিশেষ করে দারিদ্র্য পীড়িত লোকদের এবং প্রত্যন্ড় অঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, যার মধ্যে রয়েছে:

- সকল স্ড়রের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা দূর করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, বিশেষ করে উপজেলা এবং তার নিচে;
- অতিদরিদ্র ২০ শতাংশ জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা কার্ড প্রদান করে যে কোনো সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সক্ষম করা;
- হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেণ্ঢক্সে ব্যবহার ফি ব্যবস্থা চালু করা;
- ডাক্তার, নার্স, দন্ড় সার্জন, প্রযুক্তিবিদ সহ অন্যান্য নিয়োগের মাধ্যমে হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- হাসপাতালের স্বায়ত্তশাসন;

- স্বাস্থ্য সরবরাহকারী বিশেষত ডাক্তারদের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে করে তারা পলণ্টী অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান করতে আগ্রহী হয়;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের জন্য যদিও সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, তথাপি প্রকল্পগুলোর বাস্ড়বায়ন অতি ধীরগতি সম্পন্ন। এদের মধ্যে রয়েছে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম, HNPSP ইত্যাদি।

গ্রাম ও শহরাঞ্চলে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য অগ্রাধিকার দিকগুলো হলো:

- স্বাস্থ্যনীতি চূড়ান্ড় করা, ড্রাগ নীতিমালা নবায়ন এবং ড্রাগ প্রশাসন বিভাগকে আধুনিকীকরণ করা;
- জর"রি ভিত্তিতে ডাক্তার, নার্স ও মেডিকেল সহকারীদের সকল শূন্যপদ পূরণ করা;
- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী অতিসত্ত্বর নিয়োগ প্রদান;
- বর্তমানে স্বাস্থ্য সহকারী এবং FWA-এর ভূমিকা এবং দায়িত্ব কিছু ক্ষেত্রে ছাপিয়ে যাচ্ছে। তার উপর FWA'দের মধ্যে মহিলাদের প্রত্যেক বাড়ি পরিদর্শনে যেতে হয়। এক্ষেত্রে অবস্থানগত দায়িত্ব বিভাজন প্রয়োজন;
- জলবায়ুগত পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে কর্তব্যরত মেডিকেল কর্মকর্তাদের উপর বিশেষ মোবাইল ক্লিনিকের দায়িত্ব দেওয়া। দেশে ১,২০০ ইউনিয়ন সাব-সেন্টার ক্লিনিক রয়েছে যা ১৩,৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক এর মধ্যে অন্ড়র্ভুক্ত। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য এগুলোর আধুনিকায়ন প্রয়োজন;
- কম মনোযোগ পাওয়া অঞ্চলগুলোতে শিশু স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় টিকাদান কর্মসূচির (EPI) বিস্ড়ার জোরদার করা;
- অতিসত্ত্বর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, কারণ অধিকাংশ মাতৃমৃত্যু হয় দীর্ঘ রক্তক্ষরণ ও বিলম্বিত প্রসবের জন্য। এদের বাঁচানো সম্ভব যদি যন্ত্রপাতিসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর যোগান বৃদ্ধি করা যায়।

৫.৪.২। শিক্ষা

২০১০ অর্থবছরে শিক্ষাকে মৌলিক মানবিক অধিকার এবং সামাজিক মূলধন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা দেশের উন্নয়নের জন্য গুর"ত্বপূর্ণ।

এই খাতে সরকারের নতুন প্রকল্পসমূহের মধ্যে অন্ড়র্ভুক্ত হচ্ছে:্লাতক পর্যন্ড় বিনামূল্যে শিক্ষা, ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রকল্প চালু রাখা, ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি চালু করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশন জট কমানো, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষা ও গবেষণাকে উৎসাহিত করা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালিকাভুক্তিতে ছেলে ও মেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্য আসলেও Education Watch-এর রিপোর্ট অনুযায়ী তালিকাভুক্তির হার সাম্প্রতিক সময়ে হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষার নিম্মানের

সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচ্চ ঝড়ে পড়ার হার এবং পাঁচ বছরের নিচে শিক্ষা গ্রহণের নিহার স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

শিক্ষাখাতে লক্ষণীয় সাফল্য অর্জিত হলেও নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হবে:

- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন এবং তা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ড় সম্প্রসারণ করা;
- নিরক্ষতা দূরীকরণ;
- কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত একটি নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করা;
- মানসম্মত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিশ্চয়তা প্রদান করা;
- সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অংশের জন্য সহজলভ্য এবং গ্রহণযোগ্য শিক্ষা প্রদান করা;
- সার্বজনীন পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সাথে সাথে বাধ্যতামূলক কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনীকায়ন করা; এবং
- কর্মমুখী, উৎপাদনমুখী ও লিঙ্গ সমতা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

নতুন শিক্ষা নীতিতে সরকার ইতোমধ্যেই তার লক্ষ্য অন্ড়র্ভুক্ত করেছে। বর্তমানে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ খুবই কম (দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন), যা জিডিপির ২.৫ শতাংশের কাছাকাছি। আগামী ৩/৪ বছরের মধ্যে এই হার বৃদ্ধি করে ৬-৭ শতাংশে নিয়ে আসতে হবে যাতে করে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা সকলেই গ্রহণ করতে পারে।

৫.৪.৩। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

সমাজের দরিদ্র, অক্ষম, অসহায় ও দুর্যোগপীড়িত লোকদের সহায়তার জন্য সরকার বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২০১০ অর্থবছরের বাজেটে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে গুর"ত্ব দেওয়া হয়েছে:

- দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে যারা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় তাদের ভোগের ক্ষেত্রে সহায়তা করা এবং তাদের কম ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলা;
- বংশপরম্পরা দারিদ্র্য প্রবাহ হ্রাস করার জন্য মানবিক এবং অন্যান্য মূলধনী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নিয়মিতভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সক্ষম করে তোলা।

সামগ্রিকভাবে দেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কাঠামো চারটি প্রধান দিকে প্রসারিত:

- বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির জন্য বিশেষ সুবিধা;
- ক্ষুদ্র ঋণ এবং অন্যান্য সহায়তামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এবং অন্যান্য আপদকালীন সময়ে খাদ্যনিরাপত্তা বৃদ্ধি করা; এবং
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে সক্ষমতা তৈরির কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে নগদ অর্থ সহায়তা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী, দুস্থ মহিলা, দরিদ্র এবং একই সাথে স্তন্য দানকারী মা ইত্যাদি। নির্ধারিত সময়ে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এই অংশের দারিদ্র্য দূরীকরণের এই প্রকল্পগুলো অবশ্যই ভূমিকা রাখবে। এই প্রকল্পগুলো ভবিষ্যতেও চালিয়ে যেতে হবে এবং সহায়তার পরিমাণ ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি করতে হবে। ২০১০ অর্থবছরে বাজেটে ভাতার পরিমাণ এবং নগদ অর্থসহায়তা প্রকল্পের সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১০ অর্থবছরে "এক বাড়ি এক খামার" প্রকল্প পুনরায় চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে বাড়ি, ঋণসহায়তা, আত্মকর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ এবং সহজলভ্যতা সাপেক্ষে খাস জমি দিয়ে পুনর্বাসন করা। এই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ২০১৪ সালের জুনের মধ্যে ২.৯ মিলিয়ন লোক বা ০.৫৮ মিলিয়ন গ্রামীণ পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা এবং কর্মসংস্থানের, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, সুযোগ সৃষ্টি করা। এই প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে এটি কেবলমাত্র দারিদ্র্য বিমোচনেই সহায়তা করবে না বরং গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে যা সরকারের ঘরে ফেরার প্রকল্পকে শক্তিশালী করবে। ভাতা ও অন্যান্য সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নগদসহায়তা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জন্য ভালো দিক। এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও এখনও এর আওতা এবং প্রভাব নিু পর্যায়ে রয়েছে, ফলে দৃশ্যমান প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য ভবিষ্যতে এই নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

৫.৫। ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং আইসিটি খাতের উন্নয়ন

দারিদ্র্যের বির"দ্ধে যুদ্ধ এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য সরকার আইসিটি (ICT) খাতকে গুর"ত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। সুশাসন প্রক্রিয়া সহজতর করতে আইসিটি ভূমিকা রাখবে। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তব্যে (FY10) ২০২১ সালের মধ্যে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" উপহার দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করা হয় এবং আইসিটি খাতের উন্নয়নের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। অভিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকার আইসিটি (ICT) নীতিমালা ২০০৯ পাশ করে। বিশ্বে আইসিটি সেবা এবং সফটওয়্যারের ৩০০ মিলিয়ন ডলারের বাজার রয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৯ এ ৩৩ মিলিয়ন ডলার সফটওয়্যার রপ্তানি করে (সূত্র: ডেইলি স্টার রিপোর্ট/বাসস রিপোর্ট)। ২০১১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ১৫০ মিলিয়ন ডলার।

এই খাতের যথার্থ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সহায়তা দিতে হবে যেমন: নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, প্রয়োজনীয় bandwidth সুবিধা, ব্যাংক ঋণের সুবিধা ইত্যাদি। ভারত ও অন্যান্য সফল দেশগুলোর ন্যায় কতগুলো আইসিটি পার্ক ও ভিলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দ্র"ত নিতে হবে। পাশাপাশি কম্পিউটার শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫.৬। রপ্তানি বহুমুখীকরণ

বাংলাদেশের রপ্তানি আয় মূলত পোশাক শিল্প খাতের উপর নির্ভরশীল। মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭৫ শতাংশ আসে এই খাত থেকে। এই উচ্চ নির্ভরতা রপ্তানি বহুমুখীতার সংকীর্ণতাকে নির্দেশ করে, যা বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতায় অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ। তাই রপ্তানি বহুমুখীকরণের (পণ্য এবং বাজার) জন্য অধিক প্রচেষ্টা এবং সুযোগসুবিধা প্রদান অতি প্রয়োজনীয়। রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য, সিরামিকস সামগ্রী, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, আসবাবপত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে

গুর"ত্ব দেওয়া যেতে পারে। বাজার বহুমুখীকরণের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার পাশাপাশি পূর্ব এশিয়ার দেশ, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকাসহ সার্কভুক্ত দেশগুলোর বাজারের দিকে নজর দেওয়া উচিত।

অভ্যন্ড়রীণ ও বাহ্যিক উভয় চাহিদা বৃদ্ধির দর"ণ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের ঘুরে দাঁড়ানোর সংকেত পাওয়া যাচ্ছে এবং আসছে মাসগুলোতে তা আরও শক্তিশালী হবে। যদি বর্তমানের ন্যায় বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানি চাহিদা শক্তিশালী থাকে তবে ২০১০-১১ অর্থবছরে একটি যুক্তিযুক্ত সামগ্রিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য বাস্ড়বায়নের জন্য অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য পূর্বঘোষিত কর্মপন্থা এবং সহায়তা প্যাকেজ, নগদ ভর্তুকিসহ অন্যান্য সহায়তা যদি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্ড়বায়ন করা যায় তবে এটি বহুমুখীকরণের জন্য খুবই উপকারী হবে। বর্তমান উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিযোগীতায় টিকে থাকা বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের কল্যাণের বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ থাকতে হবে এবং কোনোভাবেই যেন শ্রমিক অসন্ড়োষ বৃদ্ধি না পায় সেজন্য সরকার এবং মালিক-শ্রমিক পক্ষ সবাইকে লক্ষ রাখতে হবে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির একটি বৃহৎ অংশ যেহেতু শিল্পখাত থেকে আসে, তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য রপ্তানি পণ্য এবং বাজার উভয়ই বহুমুখীকরণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৫.৭। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির জন্য কর্মসংস্থান অতীব গুর"ত্বপূর্ণ। কৃষি পণ্যের বা খাদ্য শস্যের উৎপাদন গত তিন দশকে তিন গুণ বৃদ্ধি পেলেও কৃষি খাতের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়নি। অন্যদিকে শিল্পখাতের অবদান জিডিপিতে বৃদ্ধি পেলেও সে হারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়নি। এজন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন অত্যন্ড় প্রয়োজন। বর্তমানে জিডিপিতে এ খাতের অবদান হচ্ছে মাত্র ৩ শতাংশ বা তারও কম। এ খাতের উন্নয়নে নিম্নের পদক্ষেপগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে:

- অল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পুন:অর্থায়ন স্কিমের সম্প্রসারণ;
- মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া;
- এসএমই ফাউন্ডেশনকে শক্তিশালী করা;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা। |

৫.৮। বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি (PPP) পদ্ধতি কার্যকর করা

৫.৮.১। সরকারি বিনিয়োগ

সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ২০১০ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে এডিপি বাস্ড়বায়নের হার গত কয়েক বছরের তুলনায় ভালো, কিন্তু জিডিপিতে সরকারি বিনিয়োগের অংশ বৃদ্ধির জন্য আরও ভালো বাস্ড়বায়ন প্রয়োজন। এর জন্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন দিক থেকে এডিপি বাস্ড় বায়নে মনোযোগ দেওয়া দরকার:

- প্রকল্পগুলোর মান উন্নয়ন এবং যথার্থতা;
- বাস্ড়বায়নকারী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক এবং জনবল ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- উপযুক্ত সক্ষমতা তৈরির প্রক্রিয়া, সুযোগ-সুবিধা কাঠামো এবং জবাবদিহিতার কাঠামো গ্রহণ করা;
- প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম যার মধ্যে অন্ড়র্ভুক্ত হচ্ছে প্রকল্পের ফলাফল এবং তাদের মান নিয়মিতভাবে মনিটরিং নিশ্চিত করা।

৫.৮.২। অর্থনৈতিক অবস্থার আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক অবস্থার 'পূর্ব-পশ্চিম' বিভাজন সামনে চলে এসেছে যা এটা নির্দেশ করে যে, দেশের পূর্বাঞ্চল দ্র"ত উন্নতি করছে অন্যদিকে পশ্চিমাঞ্চল পিছনে পড়ে রয়েছে। ২০১০ অর্থবছরে বাজেটের একটি অগ্রাধিকার দিক হচ্ছে "আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা।" পিছনে থাকা পশ্চিমাঞ্চল কেবল মাত্র সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়নি বরং দেশের প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সম্পদ বণ্টন কাঠামো এবং সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসম বণ্টনের শিকার হয়েছিল। তাই একই সাথে দুই ধরনের নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে:

- পিছনে পড়ে থাকা অঞ্চলে সম্পদ বরাদ্দ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- দেশের প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় নতুনভাবে সুযোগ সৃষ্টি এবং সম্পদ বরাদ্দ কাঠামোর ক্ষেত্রে বৈষম্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা।

এই অঞ্চলের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য নতুন নীতিমালার প্রয়োজন যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যে সংযোগ সাধন করবে। প্রবৃদ্ধির সাথে বর্ধিত কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণের জন্য দরিদ্র শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা এবং সম্পদ প্রয়োজন। অপ্রচলিত খাতের উদ্যোক্তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য মূলধনের সহজলভ্যতা, ব্যবসা উন্নয়ন সেবা, অবকাঠামো এবং সহায়ক নিয়ম-কানুন গ্রহণের জন্য নীতিমালা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এই নীতিমালা বাস্ড়বায়নের জন্য সরকারি বিনিয়োগ গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে অবকাঠামো এবং পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দ্র"ত সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে ২০২১ সালে মধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার প্রক্রিয়া তরান্বিত হবে।

৫.৮.৩। ব্যক্তিগত বা বেসরকারি বিনিয়োগ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত বিনিয়োগ খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। এটি অভ্যন্ড়রীণ এবং বৈদেশিক হতে পারে। বিগত বছরগুলোর তুলনায় ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ ধারণার উন্নতি হয়েছে দেশের সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত হওয়ায়। অন্যান্যদের মধ্যে দেশের বিনিয়োগ বোর্ডের রেজিষ্টার্ড বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের পরিমাণ এবং সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা (যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ) দেখা না দিলে বিনিয়োগের এই ধারা ভবিষ্যতে বজায় থাকবে।

নিরবচ্ছিন্ন ও স্বচ্ছ নীতিমালা কাঠামো ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বিশেষ করে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) আকৃষ্ট করার জন্য গুর"ত্বপূর্ণ। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের সমস্যাগুলো সকলেরই জানা। বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতায় সর্বনি" পর্যায়ে রাখতে হবে। অভ্যন্ড়রীণ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZs) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৫.৮.৪। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)

সরকার ২০১০ সালের বাজেটে পিপিপির জন্য ২,৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখলেও বাস্ড়বায়নজনিত অসুবিধার কারণে এ বাজেট ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। পিপিপি বাস্ড়বায়নের একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ থাকা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন:

- যথাযথ আইনগত কাঠামো প্রয়োজন;
- কার্যকর পিপিপি সেল';
- ভৌত অবকাঠামের নির্মাণের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রণোদনার সংস্থান ইত্যাদি।

কার্যকরি পিপিপি কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সরকারকে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ড় নিতে হবে:

- ২০০৪ সালের ব্যক্তিগত খাতের বিনিয়োগ নির্দেশনা (PSIG) সংস্থার করা আইনকে সংশোধন করে নতুন পিপিপি আইন তৈরি করা;
- যথাযথ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো, প্রয়োজনীয় জনবল এবং অন্যান্য সম্পদ নিয়ে একটি কার্যকর পিপিপি সেল গঠন করা;
- অবকাঠামো খাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য যথাযথ সুবিধা ঘোষণা করা।

৫.৯। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জন

বর্তমান বিভিন্ন সূচকগুলো নির্দেশ করে যে, আসছে মাসগুলোতে আন্ড়র্জাতিক বাজারে পণ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশ্ব অর্থনীতির সাথে অধিক সংযুক্তিতার কারণে বাহ্যিক চাপের ফলে পূর্বের চেয়ে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি অধিক বেশি প্রভাবিত হয়। যার বিভিন্ন কারণগুলোর মধ্যে অধিক আমদানি নির্ভরতা, বিশ্বব্যাপী অতিরিক্ত চাহিদার চাপ বৃদ্ধি, অভ্যন্ড়রীণ অর্থনীতির দুর্বল উৎপাদন প্রবৃদ্ধি এবং স্থায়ী ভাবে কাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থিরতা অন্যতম।

বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতিতে খাদ্য মূল্যস্ফীতি গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। এতে করে দরিদ্র জনগণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সরকার পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদের জন্য যথাযথ নীতিমালা গ্রহণ করবে এবং দরিদ্র ও খাদ্য অনিশ্চয়তায়ভোগী পরিবারগুলোকে বিভিন্ন খাদ্য সহায়তা প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। একইভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্প, স্কুল পড়ুয়াদের শিশুদের খাদ্য কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, খোলা বাজারে বিক্রি এবং গরিবদের কর্মসংস্থান প্রকল্প এবং প্রতিকূলতায় পতিত পরিবার বিশেষ করে ঝুঁকিগ্রস্ড় সময়ে খাদ্য অধিকার এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণে

স্বল্পকালে ব্যবহার করা হয়। গুর"ত্বপূর্ণ পণ্যসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে টিসিবি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশেষ করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমন্বিত আর্থিক ও রাজস্ব নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন যা মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশাকে কাঙ্খিত পর্যায়ে রাখতে পারে। একই সাথে বাংলাদেশ ব্যাংককে আর্থিক সম্প্রসারণে অবদানকারী উপাদান সনাক্তকরণ, সমস্যার স্থায়িত্ব পরিমাপ এবং বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গতিপূর্ণ যথাযথ নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে।

৬। উপসংহার

আলোচ্য প্রবন্ধে গত কয়েক বছরে অর্থনীতিতে ঘটে যাওয়া ইতিবাচক উন্নয়ন তুলে ধরা হয়েছে এবং সাথে সাথে যে সকল খাতে অধিক গুর"ত্ব দিলে দেশ মধ্য-আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে সে সকল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের বিশেণ্ডষণ অনুযায়ী বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশে উত্তরণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন:

- ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য প্রতিবছর গড়ে ৭-৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রয়োজন। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ উলেণ্ডখযোগ্য ভাবে বাড়াতে হবে। এটি একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ, তবে অসম্ভব নয়।
- কার্যকর দক্ষতা এবং উৎপাদশীলতা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনীতিকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে সীমিত সম্পদ বিশেষ করে জমি এবং জ্বালানি স্বল্পতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।
- প্রবন্ধে আলোচ্য খাতগুলোতে সংস্কার কর্মসূচিগুলো বাস্ড়বায়ন করা উচিত যাতে করে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।
- ম্যানুফ্যাকচারিং খাত জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় রপ্তানি বহমুখীকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রযুক্তি আধুনিকায়ন এবং প্রবৃদ্ধির নতুন উৎস বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নিয়মিতভাবে উন্নয়নের জন্য স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি সম্ভাব্য সমাধান খুঁজতে হবে। এক্ষেত্রে কয়লা চালিত বিদ্যুৎ পণ্ডান্টের দিকে যাওয়া যেতে পারে যার জন্য অভ্যন্ড়রীণ কয়লা খনি থেকে জর"রি ভিত্তিতে উত্তম পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন প্রয়োজন। দীর্ঘকালে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষ করে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

Bangladesh Bank (2010): *Economic Trends*. various issues.

Begum, Lutfunnahar (2007): "A Panel Study on Tax Effort and Tax Buoyancy with Special Reference to Bangladesh." Working Paper Series: WP 0715. Policy Analysis Unit (PAU), Bangladesh Bank.

BIDS (2010): "Accelarating Growth Momentum: Proposals for the National Budget 2010-11." April.

BIDS (2010): "Recent Performance of the Bangladesh Economy: An assessment of the State of the Economy and Short-Term Outlook."

Ministry of Finance (2010): *Bangladesh Economic Review.*

The Daily Star (2010): "Unfairness in tax policy must go." Tuesday, September 21.